গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ-১৬ সংখ্যা-২ মার্চ-এপ্রিল ২০১৯ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

পিঁপড়ে

ছবি : টমি টে

❑ প্রচ্ছদ কথা ১ : পিঁপড়ের বাসায় সিঁদেল চোর ২ ❑ প্রচ্ছদ কথা ২ : পিঁপড়ের ভার বহন ক্ষমতার রহস্য ৩ ❑ রসনার রসায়ন ৪ ❑ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ৬ ❑ নতুন গবেষণা ৭ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ৮ ❑ মোবাইল ঃ জনস্বাস্থ্যের ঘাতক ১০ ❑ পয়া-অপয়া শুভ-অশুভ ১১ ❑ ছাতা থেকে ডিজেল ১২ ❑ জানো কি? দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ১৩ ❑ মহাকাশ ১৪ ❑ সংবাদ ১৫ ❑ শব্দের খোঁজে, কবিতা, কার্টুন ১৬

সুভাষিতম্

'বিতর্কের ভিতরেই সত্য মূল্যায়িত হয়। ***—নিলস বোর***

আমাদের কথা : বিজ্ঞান ও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

ধুম্। ফটাস। ঘট্‌ঘট্। শিশুদের খুব প্রিয় শব্দ। তাই বাজারে হরেক রকমের যে খেলনা পাওয়া যায় তার মধ্যে নানারকমের মারণাস্ত্রেরই আধিক্য। যে যুদ্ধাস্ত্র বড়রা ব্যবহার করছে তারই অনুকরণে এগুলি তৈরি। সকলেরই লক্ষ্য এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ। শিশুদের ভিডিও গেমগুলিতেও 'মার মার' চিন্তার দাপট। টার্গেটে আঘাত করো। গুড়িয়ে দাও। ভেঙে দাও। এই শিশুরাই যখন পরিণত হচ্ছে তখন তার শৈশবের অনেক সংস্কারের সাথে 'মার মার' মানসিকতা চেতনে অবচেতনে থেকে যাচ্ছে। উপযুক্ত আধার তার এই মারণ মনকে বিকশিত করে। তার তখন ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে অনেক শত্রু। এইতো সময় শৈশবের কল্পনার ফলিত প্রয়োগের। তাই খেলনা-কল্পনা রূপান্তরিত হয় বাস্তবের যুদ্ধভূমিতে। এগিয়ে আসে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীরা। যত যুদ্ধ তত যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ। ততই ব্যবসা ততটাই লাভ। যদিও আরও অধিক মৃত্যু আনবে নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র, তবু যুদ্ধ চলতে থাকবে। থামবে না। প্রয়োজনে 'যুদ্ধ' তৈরি করা হবে।

এখানে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা অসহায়। ক্রীড়নক মাত্র।

—তাপস মজুমদার

ক ম ল বি কা শ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

প্রচ্ছদ কথা ১ : পিঁপড়ের বাসায় সিঁদেল চোর

বেশির ভাগ পিঁপড়েই মাটির নীচে বাসা তৈরি করে। এছাড়াও পাথরের খাঁজে, গাছের শুকনো ডালে ফুটো করে, গাছের পাতা জুড়ে ইত্যাদি নানা ভাবে এরা বাসা বানায়। মাটির নীচের বাসাগুলি সুড়ঙ্গের মতো হয়। এই ধরনের বাসায় সাধারণত একটি বা দুটি প্রধান দরজা থাকে। সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকে ডিম, কোনোটাতে শূককীট, কোনোটাতে খাবার-দাবার ইত্যাদি। অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রয়োজনে এদের আলাদা আলাদা ঘর থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এরা ঘরগুলি যেমন তেমন ভাবে বানায় না। প্রতিটি ঘরে যাতে বাতাস খেলে এবং উত্তাপ ও জলীয় বাষ্পের মাত্রা ঠিক থাকে সেদিকে এদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। স্থাপত্য শিল্পে এই ক্ষুদে পতঙ্গগুলির প্রযুক্তিগত কলা-কৌশল আমাদের অবাক করে বইকি! তবে মজার কথা পিঁপড়ে সমাজেও চোর আছে। এই চোর বাবাজিরা এতই চালাক যে চুরি করে ধরা পড়লেও এদের কেউ কিচ্ছুটি করতে পারে না। উল্টে যাদের ঘরে চুরি করে তাদেরই দেখিয়ে দেখিয়ে চুরি করা জিনিস চেটেপুটে খায় আর মিটি মিটি হাসে।

পাশের ঘরে চোর অথচ ধরার উপায় নেই— এমন কথা কখনো শুনেছ? পিঁপড়ে সমাজে সেইরকমই অবস্থা। ডেঁয়ো পিঁপড়েদের মতো বড় আকারের পিঁপড়েরা এই পুঁচকেগুলোকে প্রথম দিকে কোনো পাত্তাই দেয় না। বাসা বানাচ্ছিস বানা কিন্তু কোনো দিন পিছনে লাগতে আসিস না। তাহলে মেরে লোপাট করে দেব— এমনই এদের ভাবখানা। পুঁচকেগুলোও কোনো ঝামেলা করে না। ভালো মানুষের মতো বাসা বানাতে থাকে। এই সময় এদের দেখলে মনে হবে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অথচ এরা এক একটা বিচ্ছু। বাসা বানানো শেষ হলেই শুরু হয় এদের খেল। নিজেদের বাসার ভিতর থেকে বড় পিঁপড়েদের বাসার ভাঁড়ার পর্যন্ত শুরু হয় এদের সিঁদ কাটা। এই কাজ এরা এতটাই চুপি চুপি করে যে বড় পিঁপড়েরা কোনো ভাবেই টের পায় না। সিঁদ কাটা শেষ হলে শুরু হয় এদের আসল কাজ। বড় পিঁপড়েদের ভাঁড়ার থেকে খাবার চুরি করে নিয়ে এসে তোলে নিজেদের ভাঁড়ার ঘরে। প্রথম প্রথম বড় পিঁপড়েরা বুঝতে পারে না যে তাদের ভাঁড়ারে চোর ঢুকেছে। কিছুদিন পর যখন দেখে যতই খাবার ভাঁড়ারে রাখা হোক না কেন ভাঁড়ার কিছুতেই ভর্তি হচ্ছে না, তখন তাদের সন্দেহ হয়। চোর কোথায়, খোঁজ খোঁজ বলে বেরিয়ে পড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। আতিপাতি খুঁজেও চোরের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। পাশের

বাড়ির পুঁচকাগুলো বাসার ভিতরে নিজেদের কাজ নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকে। তাহলে চুরি করল কে? আর চোর গেলই বা কোথায়? এবার শুরু হল নিজেদের বাসার ভিতরে খোঁজা। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে। ছুটলো সবাই সে দিকে। তাজ্জব ব্যাপার? পাশের বাড়ির পুঁচকেগুলোরই এই কাজ? বদমাস কাঁহাকা। মারো ব্যাটাদের। কিন্তু মারবে কে? সিঁদের মুখ আর বাসায় ঢোকার প্রধান ফটক দুটোই এত ছোট যে এত বড় শরীর নিয়ে ওর ভিতর দিয়ে ঢোকাই দুষ্কর। অতএব ক্ষুদেগুলোর বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করা ছাড়া আর কিছুই ওদের করার থাকে না।

কলস গাছের পাতাতে কলসের মতো দেখতে একটা ফাঁকা অংশ থাকে। এর ভিতরে থাকে জারক রস। এই রসে একটা মিষ্টি গন্ধ থাকে। এই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কোনো পোকা এর গায়ে বসলে আর দেখতে হবে না। পা হড়কে একেবারে রসের মধ্যে। কারণ কলসের ভিতরের দিকের গা টা খুব পিচ্ছিল হয়। রসে একবার পড়লে পোকা আর উঠতে পারে না। ধীরে ধীরে জারিত হয়ে গাছের খাদ্যে পরিণত হয়। এক ধরনের পিঁপড়ে আছে যারা কলসের পিচ্ছিল গা বেয়ে সর সর করে নেমে যেতে পারে আবার উঠেও আসতে পারে। শুধু তাই নয়, কলসের ওই জারক রসে এদের কিচ্ছু হয় না। এরা এই গাছের কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকে। কোনো পোকা জারক রসে পড়তে দেখলেই এরা কলসের গা বেয়ে তর তর করে নেমে যায়। তারপর ডুবুরির মতো রসে ডুব দিয়ে পোকাটাকে কামড়ে ধরে দে-চম্পট। গাছের তো আর হাত পা নেই যে চোরকে ধরে কষে দু-ঘা লাগিয়ে দেবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না বেচারার। চোর পিঁপড়ে বিনা বাধায় গাছের শিকার নিয়ে মহানন্দে ভোজের আয়োজন করে।

Email : kbb.scwriter@gmail.com, M. 9433145112

সুজিতকুমার নাহা

প্রচ্ছদ কথা ২ : পিঁপড়ের ভার বহন ক্ষমতার রহস্য

ভার বহন ক্ষমতার বিচারে প্রাণীসমাজে কে চ্যাম্পিয়ন? উত্তর জানা না থাকলেও এই ব্যাপারে পিঁপড়ে অন্যতম দাবিদার বলেই আমার মনে হয়। বইপত্র ঘেঁটে জেনেছি, প্রজাতিভেদে পিঁপড়ে নাকি পারে নিজের ওজনের ২০ থেকে ১০০ গুণ ভার বহন করতে। প্রাণীবিদ্যায় জ্ঞানগম্যি না থাকায় এই অত্যাশ্চর্য ভারোত্তলন তথা ভার বহন ক্ষমতার রহস্যভেদ করা আমার সাধ্যে কুলোয়নি। তবে জানার খিদেটা রয়েই গিয়েছিল। যাই হোক, একদিন হঠাৎ পিঁপড়ে রহস্যের সমাধান কীভাবে হল, এবার বরং সেই গপ্পোটাই বলি।

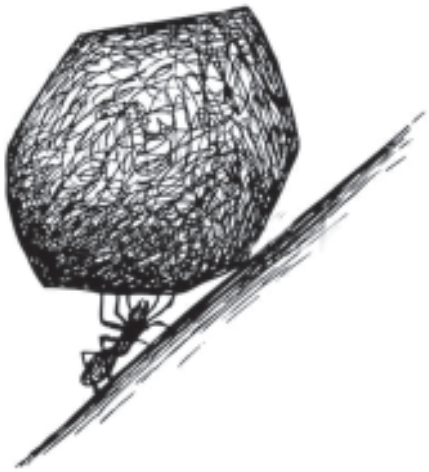

বেঙ্গালুরুতে সুমিত ও আমার দিন কাটছে পরমানন্দে। দর্জিলদা কাছেই থাকে। আমরা তিন বঙ্গসন্তান একসাথে মিলিত হই ছুটিছাটার দিনে। হৈ চৈ, গল্পগাছা, কাছেপিঠে ঘুরে বেড়ানো, বাইরে খাওয়া-দাওয়া এসবের মধ্য দিয়ে কখন যে ছুটির দিনটা কেটে যায়, টের পাই না।

স্পষ্ট মনে পড়ে, ঘটনাটা এক রবিবারের। দর্জিলদা সেদিন আমাদের এখানে হাজির হয়েছিল খুব সকালে। প্রাতরাশের জন্য নিয়ে এসেছিল আপেল, কলা, কেক, রসগোল্লা আর নলেন গুড়ের সন্দেশ। কলকাতায় দিনকয়েক কাটিয়ে কাল রাতের ফ্লাইটে বেঙ্গালুরু ফিরেছে দর্জিলদা। বাংলার মিষ্টির আগমন সেই সুবাদেই। সুমিত ও আমি দুজনেই সন্দেশ রসগোল্লা দারুণ পছন্দ করি। অথচ এগুলো বেঙ্গালুরুতে দুর্লভ। তাই দেরি না করে যে হামলে পড়ব, সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আমরা ছাড়া চুপিসারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আরও অনেকেই। সুমিত তাদের আবিস্কার করে চেঁচিয়ে উঠল, "কী সব্বোনেশে কাণ্ড! এত পিঁপড়ে এখানে এল কোত্থেকে?"

তাকিয়ে দেখি মাটিতে পড়া কেক-মিষ্টির টুকরো মুখে নিয়ে আস্তানার দিকে দৌড়চ্ছে গোটাকয়েক পিঁপড়ে। মনে পুষে রাখা প্রশ্নটা দর্জিলদাকে করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

প্রশ্ন শুনে দর্জিলদা মুচকি হেসে বলল, "রবি, তোর কথা শুনে ছেলেবেলায় পড়া একটা কবিতার লাইন মনে এল—বড়ো যদি হতে চাও ছোটো হও তবে।"

বিরস মুখে সুমিত ও আমি চাওয়া-চাওয়ি করলাম। পিঁপড়ের বিপুল ভার বইবার ক্ষমতার সাথে কবিতার লাইনটার কী সম্পর্ক সেটা মাথায় ঢোকেনি আদপেই। আমাদের অবস্থা দেখে দর্জিলদার বোধহয় করুণা হল। বলল, "ঠিক আছে। পিঁপড়ের ব্যাপারটা প্রথমে খোলসা করি। তা হলেই বুঝবি কবিতার লাইনটা হঠাৎ কেন মনে পড়ল।"

এরপর দর্জিলদা যে ব্যাখ্যান দিল তার সারকথা এইরকম : আশ্চর্যের কথা, প্রাণীবিদ্যা নয়, বিষয়টা পড়ে পদার্থবিদ্যার এক্তিয়ারে। জন্তুর সাইজের সাথে পেশির ক্ষমতার অদ্ভুত সম্পর্কের পেছনে আসলে রয়েছে 'স্কেলিং ল'-এর কারসাজি। একরত্তি আকারের দরুনই পিঁপড়ের পেশি তুলনামূলকভাবে বড় জন্তুর পেশির চেয়ে শক্তিশালী। কেন তা জানতে হলে একটু তলিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক পেশির ক্ষমতা (স্ট্রেংথ) এবং প্রাণীর ওজন কীভাবে স্কেলিং সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশির ক্ষমতা নির্ভর করে পেশির আড়াআড়ি ক্ষেত্রের (ক্রস সেকশনাল এরিয়া) ওপর। অন্যদিকে ওজনের সম্পর্ক শরীরের আয়তনের সাথে।

এবার জেনে নেওয়া যাক প্রাণীর দেহের মাপের (মানে দৈর্ঘ্যের) সাথে পেশির ক্ষমতা আর ওজন কীভাবে পাল্টায়। পেশির ক্ষমতার সম্পর্ক মাপের বর্গের সাথে হলেও শরীরের আয়তনের (ও ওজনের) সম্পর্ক কিন্তু মাপের ঘনকের সাথে। সহজ কথায়, মাপ দ্বিগুণ হলে পেশির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে চারগুণ কিন্তু আয়তন (ও ওজন) বাড়বে আটগুণ। তিনগুণ সাইজওয়ালার পেশি নয়গুণ শক্তিশালী হলেও আয়তন (ও ওজন) অনেকটাই বেড়ে হবে সাতাশগুণ। অর্থাৎ মাপ বাড়ার সাথে প্রাণীর ওজন লাফিয়ে লাফিয়ে যেভাবে বাড়ে, পেশির ক্ষমতা তত দ্রুতলয়ে বাড়ে না। ব্যাপারটা অন্যভাবেও বলা যায়—যে যত ছোট, তার পেশির ক্ষমতা তুলনায় তত বেশি। পিঁপড়ের বিপুল ভার বইবার ক্ষমতার রহস্য আসলে লুকিয়ে আছে প্রাণীটির আকারের ক্ষুদ্রতাতেই।

নাতিদীর্ঘ ভাষণ শেষ করে দর্জিলদা আমার কাছে জানতে চাইল, পিঁপড়ের ভারোত্তলন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবটা ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছি কিনা।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই দর্জিলদা বেজায় খুশি হয়ে বলল, "এবার তাহলে কবিতার লাইনটা মনে কর। কবি অন্য অর্থে বললেও কথাটা খাটে প্রাণীদের সাইজ ও স্ট্রেংথ-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। যে প্রাণীর আকার যত ছোট, তুলনামূলক ক্ষমতার বিচারে সে তত বড়, মানে তত বেশি ক্ষমতাবান! বেশ মজার ব্যাপার, তাই না?"

Email : sk.naha@gmail.com., M. 9830367036

অমিতাভ চক্রবর্তী

রসনার রসায়ন

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন', বহুল প্রচলিত এক প্রবাদবাক্য। নিন্দুকরা বলেন সাবজেক্ট হিসাবে রসায়নেরও নাকি তাই অবস্থা! যার মধ্যে রসকস কিচ্ছু নেই তারই নাম কিনা রসায়ন! স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্লাসরুমে তাদের রসায়ন শিক্ষককে ব্ল্যাকবোর্ডে কোনো জটিল আনবিক গঠন বা রাসায়নিক সমীকরণ কিংবা রাসায়নিক বন্ধন লিখে গম্ভীর মুখে পড়াতে দেন, তখনো অনেককেই অমনোযোগী হয়ে পড়তে দেখা যায়। যদিও কোনো কোনো শিক্ষক আবার আণবিক মডেল ব্যবহার করে বিষয়টিকে মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেন! তবে এই ব্যাপারে অধ্যাপক রিচার্ড জের-এর পদ্ধতিটি কিন্তু একেবারে অভিনব। অধ্যাপক জের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পড়ান। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনি সোজা চলে যান ল্যাবরেটরিতে। তবে তা আমাদের চেনা কোনো রসায়নাগার নয়। এই ল্যাবরেটরিতে অধ্যাপক মশাই নিজে ওভেনে মাংস রাঁধতে শুরু করেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এ হয়তো কোনো রান্নার ক্লাস! কিন্তু অধ্যাপক জেবের তত্ত্বাবধানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য চলতে থাকা এই কোর্সটির নাম Chemistry in the Kitchen, যেখানে বক্তৃতা, পর্যবেক্ষণ এবং সেমিনার ছাড়া রান্না ও খেয়ে দেখার কাজটিও হয়। ফ্যাকাসে মাংসের টুকরোগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাইংপ্যানে রঙ বদলাতে শুরু করে। অধ্যাপক জের তাঁর ছাত্রদের বোঝাতে থাকেন এক বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্যই বদলে যাচ্ছে মাংসের রঙ ও গন্ধ। একে মিলার্ড বিক্রিয়া বলে। অ্যামিনো অ্যাসিড ও শর্করার মধ্যে ঘটে যাওয়া এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই রান্না করা খাবার বাদামী বর্ণের হয়। কেক, বিস্কুট বা বিভিন্ন টোস্টেড খাবার তৈরির সময়ও এই মিলার্ড বিক্রিয়া হয়ে থাকে। আর এভাবেই রান্না বা খাবার তৈরির সময় ঘটে চলা রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

তাহলে রসায়ন যে শুধুই অ্যাসিড-ক্ষার বা বোতলে থাকা নানারকম রাসায়নিকের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, তা আর বলা যাচ্ছে না। আমাদের হাতে কলমে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোও তো সেই রান্নাঘর থেকে! আদিম যুগে দলবদ্ধভাবে শিকারের মাংস ঝলসে খাওয়ার সময় থেকেই যার সূত্রপাত। রান্নার ফলে খাবার যেমন স্বাদে-গন্ধে ভরে ওঠে তেমনি হজমেও সুবিধা হয়। এবার রান্নার সময়ে খাবারে ঘটে চলা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পরিবর্তনগুলোর দিকে খুঁজে দেখা যাক।

প্রথমেই তাকানো যাক অধ্যাপকের মহাশয়ের রসায়ন ক্লাসে মাংস রান্নার দিকে। কাঁচা মাংসকে (এবং কখনো মাছকে) ম্যারিনেট করার সময় সাধারণতঃ তেল, মশলা ও অ্যাসিড (ভিনিগার বা লেবুর রস) ব্যবহার করা হয়। যদিও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ঐতিহ্য অনুযায়ী মাছকে মাখন সহযোগে তীব্র ক্ষারীয় মাধ্যমে ম্যারিনেট করার প্রচলনও লক্ষ করা যায়। এই অ্যাসিড বা ক্ষার মাধ্যমে আসলে প্রোটিনের ডিনেচারেশন (গঠন সহ স্বাভাবিক গুণভ্রষ্ট হওয়া) ঘটে এবং মাংস বা মাছের মধ্যেকার কোলাজেন তন্তুগুলি আংশিক ভেঙে গিয়ে সংযোগকারী কলা (tissue)-গুলিকে আলগা করে দেয়। ফলে যে আণুবীক্ষণিক সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয় সেগুলির মধ্যে দিয়ে তেল-মশলা চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করে। তাছাড়া খাবার লবণের ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। লবণের উপস্থিতিতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছ-মাংসের ভিতরকার জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে এবং প্রোটিন তন্তু ভাঙন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এই ম্যারিনেট করা মাংসে ওভেনের তাপে ঘটতে থাকে এক বিশেষ

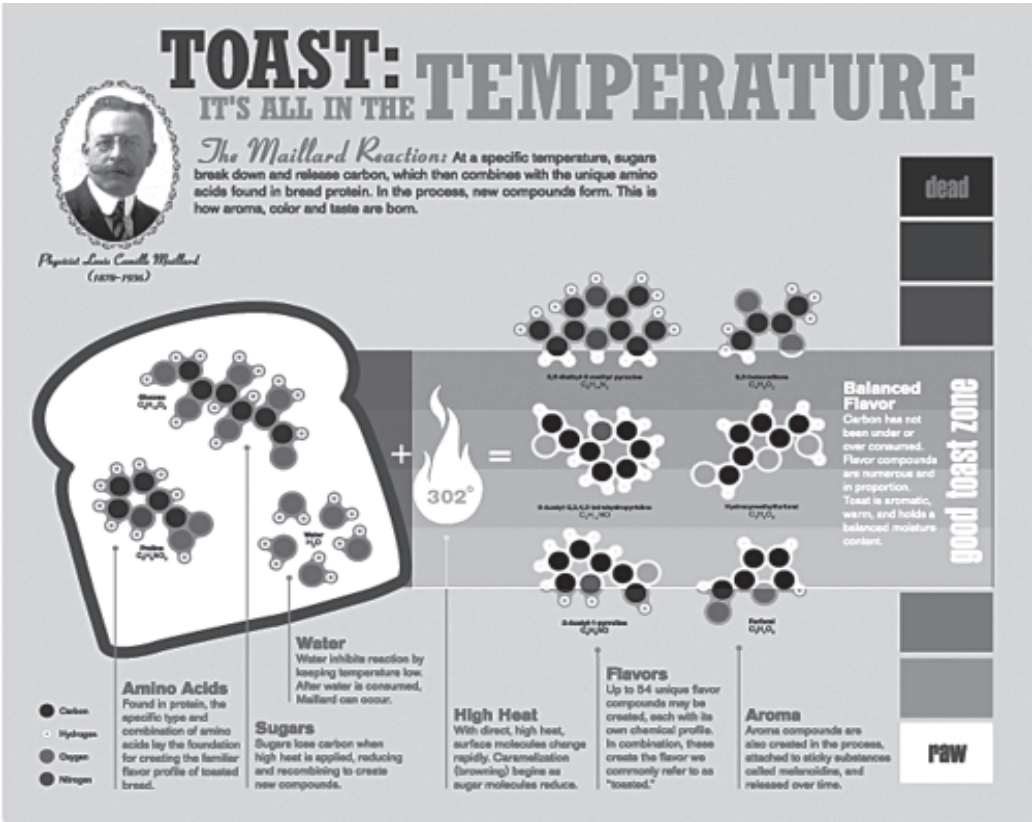

রাসায়নিক পরিবর্তন, যেখানে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড বিক্রিয়া করে বিভিন্ন বিজারক শর্করার সঙ্গে। আসলে এই প্রক্রিয়ায় শর্করার কার্বোনিল মূলক প্রোটিনে উপস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হরেকরকম অণু যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করে। যার ফলে একদিকে যেমন মাংসের রঙ বাদামী হয়ে যায় তেমনি বিশেষ গন্ধও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রসায়নবিদরা এই বিক্রিয়াটিকে বলেন মিলার্ড বিক্রিয়া (Maillard Reaction)। সাধারণতভাবে ১৪০ থেকে ১৬৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় এই বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এর চেয়ে বেশি উষ্ণতায় আবার শর্করার ক্যারামেলাইজেশন (উত্তাপে বাদামী ও বিশেষ মিষ্টি গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়া) ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় ক্যারামেলানস্ (caramelans), ক্যারামেলিনস্ (caramelens) ও ক্যারামেলাইনস্ (caramelins) নামে তিন ধরণের পলিমার উৎপন্ন হয়, যার ফলে খাবারের এই বাদামী রঙ। আর উদ্বায়ী বিভিন্ন ডাইঅ্যাসিটাইল (diacetyl) যৌগের জন্যই রান্নার সময় খাবারের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। যে-কোনো গ্রীল্ড এবং রোস্টেড খাবার এমনকি কেক বা বিস্কুট তৈরির সময়ও প্রধান ভূমিকা পালন করে মিলার্ড বিক্রিয়া। তবে বিস্কুট এবং কেক জাতীয় খাবারের বিশেষ সুবাসের জন্য দায়ী রাসায়নিক পদার্থটি হল ৬-অ্যাসিটাইল-২, ৩,৪,৫-টেট্রাহাইড্রক্সিপিরিডিন। আসলে মিলার্ড ব্রাউনিং এবং ক্যারামেলাইজেশনের সম্মিলিত প্রভাবেই রান্না করা কোনো খাবারের বিশেষ ধরনের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ থাকে। তবে সঠিক রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য রান্নার উপযুক্ত সময় বরাদ্দ থাকা জরুরি। কিন্তু আরো বেশি তাপমাত্রায় ও দীর্ঘ সময়ে খাবারে উপস্থিত পদার্থের অণুগুলির ভাঙ্গন শুরু হয় ও শেষে জলীয় এবং উদ্বায়ী অংশ অপসারিত হয়ে কার্বনসমৃদ্ধ অবশেষ পড়ে থাকে, যা আসলে খাবার পুড়ে যাওয়া হিসাবে পরিচিত।

আর শাকসবজি রান্নার সময় খাবারের রঙ ও গঠনগত পরিবর্তন নির্ভর করে সেসবে উপস্থিত হেমিসেলুলোজ এবং পেকটিনের মতো সংযোজক পদার্থের অণুগুলির উপর। তাপ, লবণ ও উপযুক্ত মশলা সমৃদ্ধ শাকসবজি সেদ্ধ হওয়ার সময় তাতে উপস্থিত বিপুল পরিমাণ কোষ (cell)-এর প্রাচীর বিনষ্ট হয় এবং জলীয় অংশ বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে সংযোজন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খাবার নরম ও সুস্বাদু হয়। তবে আলু বা অন্যান্য শর্করা জাতীয় খাদ্য (যেমন ভাত) রান্নার সময় শর্করার কণাগুলি জল শোষণ করে ফুলে ওঠে ও শেষে ফেটে যায়। ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অ্যামাইলেজ কণাগুলি শর্করাকণার আধা-কেলাসীয় গঠন ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং জলের অণুদেরকে সঙ্গে নিয়ে নতুন এক নমনীয় গঠনসজ্জা লাভ করে।

তবে যে-কোনো খাবার রান্নার সময় নির্গত সুবাস কিন্তু আসলে মশলার উপস্থিতিতে রন্ধনকালে নির্গত বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব অণুর প্রভাব। কিন্তু পরীক্ষাগারে ঘটে চলা যে-কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতোই এখানেও বিক্রিয়কের সঠিক আনুপাতিক পরিমাণ, উপযুক্ত তাপ ও সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভালো রাধুনী আসলে একজন ভালো রসায়নবিদ যিনি রসনার উপযুক্ত আয়োজনটি কতগুলি উপযুক্ত কাঁচামালের সাহায্যে সফলভাবে করে থাকেন। তাহলে রসায়নে রস নেই এই কথাটি আর বলা চলে কি?

Email : acnbu13@gmail.com., M. 9434377067

সমর বাগচী

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

নূতন তথ্য জানাচ্ছে যে CO_2-এর পরিমাণ যদি 1.2% কমানো হয় তাহলে পৃথিবীর অর্থনীতিতে এক গভীর সংকট দেখা দেবে। জলবায়ু সংকট রুখতে গেলে যেখানে CO_2-এর পরিমাণ কমানো প্রয়োজন সেখানে পৃথিবীর CO_2 ছাড়ার পরিমাণ আবার বেড়ে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ সালে CO_2 ছাড়ার পরিমাণ বাড়েনি। কিন্তু, কয়েক সপ্তাহ আগে যে সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা জানাচ্ছে যে ২০১৭ সালে CO_2 ছাড়ার পরিমাণ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টন বেড়ে গেছে। মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭১০ কোটি টন। এই বৃদ্ধিতে চিনের বৃদ্ধি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১০ কোটি টন। তার পরেই ভারতের ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন। তুরস্ক ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন, ইউরোপ/ই ইউ-২৮ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন, ইরান ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন, দক্ষিণ কোরিয়া ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন, ইন্দোনেশিয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন এবং রাশিয়া ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন। জাপান ও ব্রাজিলের একই থাকে ১০ লক্ষ টন করে। জার্মানি ২০ লক্ষ টন, আমেরিকা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৯০ লক্ষ টন কমিয়েছে। এই খবর পাওয়া গেছে ইউরোপিয়ান এমিসন ডেটা বেস ফর গ্লোবাল এট্‌মস্ফীয়ারিক রিসার্চ (EDGAR) থেকে যাদের গ্রিন হাউস গ্যাস সম্বন্ধে তথ্য পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এই সংস্থা ১৯৭০ সাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের তথ্য প্রতি বছর দিয়ে থাকে।

এবার দেখা যাক ২০১৭ সালের সাম্প্রতিক তথ্য আমাদের কি জানাচ্ছে? এই তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আশান্বিত হবার মতো কিছু হয়নি। বিশ্ব অর্থনীতি CO_2 কমাচ্ছে না। তিন বছর আগে যখন থেকে CO_2 ছাড়ার পরিমাণ প্রায় একই থাকা শুরু হয় তখনো কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩% বৃদ্ধি ঘটছিল। মিডিয়াতে এবং বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় আশার আলোর কথা বলা শুরু হয়েছিল। বলা শুরু হচ্ছিল যে, CO_2 কমলেও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু, সেই আশা মরীচিকা। আগেই দেখানো হয়েছে পৃথিবীতে CO_2 ছাড়ার পরিমাণ কীভাবে বাড়ছে। চিনের নিঃসরণ মাথাকিছু ৭.৭ মেট্রিক টন যা ভারতের ৪গুণ। ভারতের নিঃসরণ মাথাপিছু ১.৮ মেট্রিক টন। ২০১৭ সালে ইউরোপের মাথাপিছু নিঃসরণ ছিল ৭ মেট্রিক টন।

আমরা এটা জানি যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলো চিন ও ভারতের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি CO_2 ছেড়েছে যুগ যুগ ধরে তাদের তথাকথিত উন্নয়নের জন্য। যা সম্ভব হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করে। আজ, পৃথিবী থেকে উপনিবেশ শেষ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ আজও চলছে। তৃতীয় বিশ্ব ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ, এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে নানারকম সাহায্য পায়। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের মানুষ বিদেশ থেকে ডলার পাঠায়। এই সমস্তের পরিমাণ হল বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন সমান ১-এর পিঠে ১২টা শূন্য)। অথচ, তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রতি বছরে বেরিয়ে যায় ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, নীট ২ ট্রিলিয়ন ডলার বেরিয়ে যায়। এই বহির্গমনই সব গল্প নয়। ভারত, বাংলাদেশের মতো বিভিন্ন দেশ তুলো থেকে তৈরি জিনিস যখন রপ্তানী করি তখন আমরা ভার্চুয়াল জলও রপ্তানী করি। এক কিলো তুলো উৎপন্ন করতে প্রায় ২২৫০০ লিটার জল লাগে। তাই যখন রপ্তানি করি তখন আমাদের দেশের মাটির নিচের জলের স্তর নিচে নেমে যায়। আমাদের উন্নয়নের হিসেবে প্রকৃতির এইসব অবক্ষয়য়ের খরচের হিসেব ধরা হয় না। আমরা রপ্তানি করি ডলার রোজকার করার জন্য। ডলার কেন প্রয়োজন হয়? বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লাগে তেল আমদানি করতে। তেল কেন আমদানি করি? কেননা ভারতের বাবু-বিবিরা গাড়ি চাপবেন। তার জন্য চওড়া চওড়া রাস্তা, ফ্লাই ওভার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেট আর রেল করিডর, পোর্ট ইত্যাদি কত কি প্রয়োজন। অথচ, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ বাস করে এই ভারতে, প্রতি দিন সেকেন্ডে একটি শিশু মারা যায় অপুষ্টিতে, লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করে ঋণের দায়ে। বড় জ্বালা করে তাই ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইলাম।

ফিরে আসি বিষয়ে। EDGAR-এর যে তথ্য আগে দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে শিল্পোন্নত Annex1 দেশগুলো তাদের CO_2 কমানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশ করেনি। যদিও ইংল্যান্ডে, জার্মানি সৌর ও বায়ু শক্তি এবং আমেরিকা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার কিছুটা বাড়িয়েছে। কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল। তা, পৃথিবীর প্রকৃতিকে বিপন্ন না করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশের উন্নতি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তার তুলনায় কম।

এছাড়া, আরেকটা বিষয় ভেবে দেখা উচিৎ। বিশ্বায়নের পর উন্নত দেশ তাদের বেশি শক্তির প্রয়োজন এমন বহু শিল্প চিন ইত্যাদি দেশে স্থাপন করতে শুরু করে। সেইসব দেশে শ্রম সস্তা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মকানুন কম বলে। তাই, শিল্পোন্নত দেশের CO_2 নিঃসরণ কম দেখায়। শিল্পোন্নত দেশ যে সমস্ত জিনিস আমদানি করে তা উৎপন্ন করার জন্যে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তা যদি হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে শিল্পোন্নত দেশের নিঃসরণ ১৩০ কোটি টন বেড়ে যাবে। এর সাথে ধরতে হবে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ক্রমান্বয়ে CO_2 বৃদ্ধির ইতিহাস আর উপনিবেশের দেশগুলোর পিছিয়ে পরা।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে নিঃসরণের যে বিরাট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালের পর থেকেই তা কমে প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ২০১৬ সাল অব্দি। কারণ অর্থনৈতিক মন্দা। আবার বাড়তে থাকে ২০১৭ সাল থেকে। অধুনা নবীকরণযোগ্য শক্তির বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে বছরে CO_2 বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে তা হল ২০০৯ সাল। ২০০৭-২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর। ২০০৮ সাল লীপ ইয়ার বলে ১ দিন বেশি ধরলে সে সালে নিঃসরণ একটু বেশি দেখাবে।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে যদি নিঃসরণ ১.২% কমে যায় তাহলে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে। ২০০৮ সালে যে মন্দা এসেছিল তার প্রভাব এখনো শ্রমিকদের ওপর পড়ছে। আমেরিকা এবং ইউরোপে তার তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে। কিন্তু, আই পি সি সি-এর সাম্প্রতিক বিশেষ রিপোর্ট আমাদের জানাচ্ছে যে পৃথিবীর CO_2 নিঃসরণ আরো অনেক কমাতে হবে যদি জলবায়ু বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হয়।

বর্তমান যে পুঁজিবাদী শিল্প সমাজ তা অনেকটা পাগলা ঘোড়ায় চাপার মতো। নামা যায় না। টিকে থাকতে গেলে অর্থনীতিতে বৃদ্ধি ঘটাতেই হবে। ঘটানোর অর্থ শক্তির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি। সেই শক্তি বৃদ্ধি আসছে জীবাশ্ম জ্বালানী পুড়িয়ে। পৃথিবীর যে শক্তির প্রয়োজন তা যোগান দেওয়ার মতো নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন করা এখনই সম্ভব নয়। তা করা গেলেও আজ সমাজ ও প্রকৃতির যে চূড়ান্ত সংকট তাকে ঠেকানো যাবে না। আজ প্রয়োজন বিকল্প উন্নয়নের এক নূতন সমাজ সৃষ্টির। কিন্তু, তার আলোচনা আরেক প্রবন্ধের বিষয়।

Email : samar.bagchi@yahoo.com., M. 9433526839

নতুন গবেষণার অলিন্দে

অমিতাভ চক্রবর্তী

প্লাস্টিক-বর্জ্য থেকে জ্বালানী

১৯৫৪ সাল। গিউলিও ন্যাটা নামে এক ইটালিয় রসায়নবিদ গবেষণাগারে পলিপ্রোপিলিন তৈরি করে ফেললেন। তিনি জার্মান গবেষক কার্ল জিগলারের পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে এইক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত অনুঘটক পরবর্তীতে জিগলার-ন্যাটা অনুঘটক নামে পরিচিত হয়। কেবল পলিপ্রোপিলিনই নয়, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কিছুদিনের মধ্যেই তৈরি হল নানারকম পলিস্টাইরিন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ ঘটল প্লাস্টিকের। কাপ-প্লেট, জলের বোতল, ক্যারিব্যাগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্যাকেজিং মেটেরিয়াল এমনকি সিরিঞ্জ, ওষুধের বোতল এবং অধিকাংশ মেডিক্যাল কিট তৈরিতেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল পলিস্টাইরিনের ব্যবহার। অপচনশীল নানারকম প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিগত ৬৫ বছরে মানুষ প্রায় ৮.৩ লক্ষ কোটি টন প্লাস্টিক উৎপন্ন করেছে। এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিকের মধ্যে মোটামুটি ১২ শতাংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে (যার প্রভাবে সরাসরি বায়ু দূষিত হয়েছে) এবং ৯ শতাংশ কোনো ভাবে পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে। আর বাকি ৭৯ শতাংশ মিশে গেছে মাটি বা সমুদ্রের জলে। গবেষকরা হিসাব কষে দেখেছেন, এই হারে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সাগরে মোট প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ হবে জলজ প্রাণীর পরিমাণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে চলেছি আমরা।

এই সংকটময় ভবিষ্যতের কথা ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানীদেরকেও। আমেরিকার একদল গবেষক সম্প্রতি তাদের সাফল্যের কথা প্রকাশ করেছেন ACS Sustainable Chemistry and Engineering নামক জার্নালে। ২৯শে জানুয়ারি প্রকাশিত সংখ্যায় তাঁরা জানিয়েছেন এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য (যা আসলে পলিঅলিফিন জাতীয় যৌগ)-কে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জ্বালানীসহ আরো নানারকম প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিবর্তন করা সম্ভব। কাই ওয়াং এবং চেন ওয়ান-তিং, পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই গবেষকের উদ্ভাবিত বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ পলিঅলিফিন বর্জ্যকে বিভিন্ন মনোমার, জ্বালানী, ন্যাপথা এমনকি কোনো বিশুদ্ধ পলিমারে রূপান্তর করা সম্ভব। ওদের পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে নিষ্কাষিত ন্যাপথা আবার একাধিক জৈব যৌগের (যেমন- কেরোসিন, মিনারেল, স্পিরিট) সোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষকদের মতে এইভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানী দিয়ে প্রতি বছর গোটা বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ গ্যাসোলিন বা ডিজেলের চাহিদা মিটতে পারে। একই সঙ্গে পরিবেশে কমবে প্লাস্টিক বর্জ্য। কেবল বিজ্ঞানীরাই নন, আমরা সচেতন মানুষরাও তো এই স্বপ্নই দেখি!

অ নি ন্দ্য দে

অনন্ত শক্তি প্রদায়িনী ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড

"ফানেলের মত একটা যন্ত্র খুব জোরে কাঁপছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সোজা রডের মত একটা রশ্মি। তার চলার পথে মানুষজন-ঘরবাড়ি যা কিছু পড়ছে, সবাই এক লহমায় পাল্টে যাচ্ছে সাদা আলোর শিখায়। কানে-তালা-ধরা এক বীভৎস শব্দে পুড়ে যাচ্ছে সবকিছু"। না, এটা কারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়। নিছকই কল্প-বিজ্ঞানের গল্প। 'দি ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস্' বইতে এভাবেই কাল্পনিক যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস্ ১৮৯৮ সালে। কিন্তু এরকম একটা আলো যে বাস্তবেও সম্ভব হতে পারে, সেটা প্রথম আমরা পেলাম আইনস্টাইনের গবেষণায়। ১৯১৬ সালে বিকিরণের সাথে পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসে। কিন্তু সে সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ পেতে লেগে গেল অনেকটা সময়। ওয়েল্সের কল্পনার সেই 'ভয়ঙ্কর আলো' আর আইনস্টাইনের ভাবনাজাত সেই 'সম্ভাবনাময় আলো' এক 'অদ্ভুত আলো' হিসেবে বাস্তব রূপ পেল ১৯৬০ সালে, থিওডোর মাইম্যানের গবেষণাগারে। দিনটা ছিল ১৬ মে। সবাইকে চমকে দিয়ে টেবিলে রাখা রুবির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক উজ্জ্বল আলো। লাল রঙের সরু একটা রশ্মি সোজা চলে গেল অনেক দূর, ছড়িয়ে পড়ল না একটুও। জন্ম নিল LASER (লেসার), যার পোষাকি নাম Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation।

এরপর থেকে লেসারের জয়যাত্রা অব্যাহত। আমাদের অতি পরিচিত লেসারের ব্যবহার এখন শপিং মল-এর বারকোড স্ক্যানার থেকে শুরু করে কম্পিউটারের ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অস্ত্রোপচার সর্বত্রই। সেই লেসারের মুকুটে যুক্ত হল আরও একটা পালক। ২০১৮ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল লেসার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যই। আর্থার অ্যাশকিন আর জেরার্ড মৌরুর সাথে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। মাদাম কুরী (১৯০৩) এবং মারিয়া জিওপার্ট মেয়ারের (১৯৬৩) পর তৃতীয় মহিলা পদার্থবিদ হিসেবে নোবেল পেলেন ডোনা। এই পর্বে আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব সেই ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড, তার গবেষণা, তার সাফল্য।

কানাডার ওন্টারিতে ডোনার জন্ম ১৯৫৯ সালের ২৭ মে। স্কুল স্তরের পড়াশোনা শেষ করে ভর্তি হন ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারণ সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স কোর্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেসার ও ইলেক্ট্রো-অপটিক্স। লেসার প্রযুক্তি নিয়ে ডোনার হাত পাকানো শুরু সেখানেই। ১৯৮১ সালে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে ভর্তি হলেন আমেরিকার রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ অপটিক্স-এ। সেখানকার ল্যাবরেটরি ফর লেসার এনারজেটিক্স-এ শুরু হল গবেষণা। গুরু হিসেবে পেলেন জেরার্ড মৌরুকে। আর গবেষণার বিষয় পালস্ড লেসার। আসলে বেশ কিছু লেসার থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আলো আসে। তাদেরকে বলা হয় নিরবচ্ছিন্ন লেসার। কিন্তু কোনও কোনও লেসার থেকে বেশ কিছুটা আলোকশক্তি একসঙ্গে বেরিয়ে আসে একটা স্পন্দন হিসেবে। এরকম স্পন্দনের স্থায়িত্ব খুব কম, ১ সেকেন্ডের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ (পিকোসেকেন্ড) থেকে ১ সেকেন্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগের (ন্যানোসেকেন্ড) মধ্যে। এই সময়টুকুর পর বেরোয় আরেকটা স্পন্দন, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। এইভাবে চলতে থাকে আলোর জেট। এরাই হল পালস্ড লেসার। মৌরু আর ডোনা এই পালস্ড লেসার সংক্রান্ত গবেষণার পুরোধা। তবে তাদের গবেষণার প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাথমিক কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার।

লেসারের ক্ষেত্রে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার শীর্ষ ক্ষমতা আর তার তীব্রতা। কোনও একটা আলোক স্পন্দনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেই বলা হয় শীর্ষ ক্ষমতা। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সে সবথেকে বেশি যতটা আলোক শক্তি ছড়িয়ে দিতে পারে তার মান। এর ব্যবহারিক একক ওয়াট। এই শীর্ষ ক্ষমতাকে যেভাবে লেখা হয় তা হল :

$$\text{শীর্ষ ক্ষমতা} = \text{ধ্রুবক} \times \frac{\text{স্পন্দনের শক্তি}}{\text{স্পন্দনের সময়কাল}}$$

এখানে ধ্রুবকের মান ০.৮৮ থেকে ০.৯৪-এর মধ্যে হতে পারে। সুতরাং, খুব কম স্থায়িত্বের স্পন্দনের ক্ষেত্রে মোট শক্তির পরিমান মাঝারি মাপের হলেও তার শীর্ষ ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। আবার নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে লম্বভাবে কোনো লেসার রশ্মি এগিয়ে গেলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে স্পন্দনের ক্ষমতাই হল ঐ লেসারের তীব্রতা। সাধারণত এই তীব্রতাকে মাপা হয় ওয়াট প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার এককে।

ছয়ের দশকের পর থেকে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে স্পন্দনের সময়কাল অনেকটা কমানো গেলেও প্রতি স্পন্দনে শক্তির পরিমাণ বা তার শীর্ষ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তার জন্য দরকার ছিল প্রতি স্পন্দনে নির্গত ফোটনের সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটাকে খুব বেশি বাড়ানো যায়নি কারণ তাতে লেসারের যন্ত্রাংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে দিচ্ছিল। সমস্যাটার সমাধান করতে হলে নির্গত আলোকস্তম্ভের ব্যাসার্ধ অনেকটা বাড়ানো দরকার। তাতে তীব্রতা অনেকটা কমে, ফলে যন্ত্রাংশগুলো বাঁচে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যন্ত্রের আকার যেমন বাড়বে, তৈরির খরচও বেড়ে যাবে অনেকগুণ। উপরন্তু বিবর্ধককে ঠান্ডা করার

জন্য যাতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়, তার জন্য সারা দিনে অল্প কয়েকবার যন্ত্র চালানো ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

লেসার প্রযুক্তির এই সন্ধিক্ষণে এসে মাস্টারস্ট্রোকটা দিলেন ডোনা আর মৌরু। ১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর 'অপটিক্স কমিউনিকেশনস' পত্রিকায় ছাপা হল তাদের পেপার 'Compression of Amplified Chirped Optical Pulses', আন্তর্জাতিক স্তরে ডোনার লেখা প্রথম গবেষণাপত্র। মাত্র তিন পৃষ্ঠার সেই প্রবন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করা হল তাদের পর্যবেক্ষণের খুটিনাটি। প্রথমে ১৫০ পিকোসেকেন্ড সময়কালে ন্যানোজুল (মানে ১ জুলের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ) পরিমান শক্তির একটা স্পন্দনকে পাঠানো হল ১.৪ কিলোমিটার লম্বা আলোকতন্তুর মধ্যে দিয়ে। বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় আলোকতন্তুর

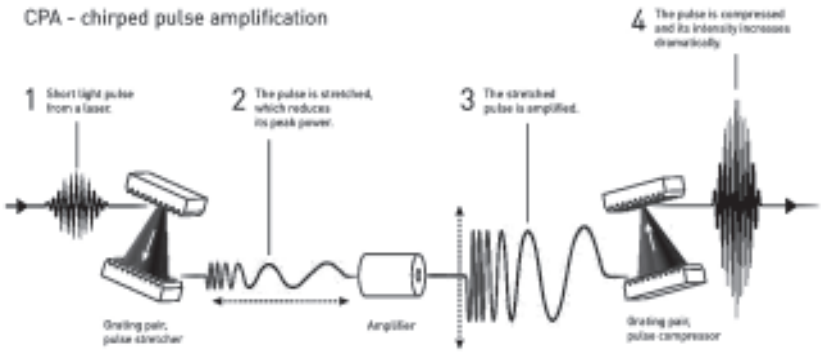

ভেতরে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হল যাতে কম কম্পাঙ্কের লালচে আলো খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে, কিন্তু বেশি কম্পাঙ্কের নীলচে আলো যাবে খুব ধীর লয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবে স্পন্দন কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে; এর স্থায়িত্ব হবে তিনশো পিকোসেকেন্ডের কাছাকাছি। এক্ষেত্রে ঐ স্পন্দনের শীর্ষ ক্ষমতা অনেকটাই কমে যাবে। এবারে ঐ ছড়িয়ে যাওয়া স্পন্দনকে বিবর্ধিত করা হল অনেকখানি। যন্ত্রাংশের যাতে কোনোরকম ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থাও করা হল। সবশেষে প্রতি মিলিমিটারে ১৭০০ লাইন টানা এক জোড়া গ্রেটিং-এর সাহায্যে ঐ বিবর্ধিত স্পন্দনকে আবার চেপে ছোট করে দেওয়া হল অনেকখানি। এখন তার স্থায়িত্ব কমে গিয়ে হল দুই পিকোসেকেন্ডের কাছাকাছি। ফলে নির্গত স্পন্দনের শক্তি হল ২ মিলিজুল। অর্থাৎ এক ধাক্কায় শক্তির পরিমাণ বেড়ে গেল দশ লক্ষ গুণ। তৈরি হল অতি ক্ষুদ্র সময়কালের সুতীব্র লেসার। পাখি যেমন ছোট ছোট করে জোরালো শিস দিয়ে গান গায়, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে CHIRP, সেই অনুসঙ্গেই এই পদ্ধতির নাম রাখা হল Chirped Pulse Amplification (সংক্ষেপে CPA)।

গবেষণাপত্রের শেষ অংশে ১০০ পিকোসেকেন্ডেরও কম সময়কালের স্পন্দনকে CPA পদ্ধতিতে ০.৫ পিকোসেকেন্ড সময়কালের স্পন্দনে রূপান্তরিত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ডোনা। পরপর অনেকগুলো বিবর্ধক লাগিয়ে স্পন্দনের শক্তি কয়েকশো মিলিজুলে তুলে আনার ভাবনাও ছিল তার প্রবন্ধে। তার সঙ্গে সঙ্গে এমন দাবীও করেছিলেন যে, এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পিকোসেকেন্ডের কম সময়কালের স্পন্দন তৈরি করা সম্ভব যাতে স্পন্দনের শক্তিকে জুল এককে মাপা যাবে। কথা রেখেছিলেন ডোনা। ১৯৮৬-৮৭ সালে আলোকতন্তুর বদলে এক জোড়া গ্রেটিং ব্যবহার করায় CPA পদ্ধতি যখন আরও অনেকটা উন্নত হয়েছে, ঠিক তার পরে পরেই ১৯৮৮ সালে ডোনা তার দলবল নিয়ে ন্যানোজুল শক্তির স্পন্দন পাঠিয়ে যে স্পন্দন তৈরি করলেন তার শক্তি সত্যিই জুল এককে মাপা সম্ভব। মানে নির্গত শক্তি বেড়ে গেল একশো কোটি গুণ! আর সেখানেই এর মাহাত্ম্য। নতুন নতুন অজস্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার রাস্তা খুলে দিল এই CPA।

CPA আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পর থেকেই একটা কথা বিজ্ঞানীমহলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল— T3, টেব্‌ল-টপ টেরাওয়াট লেসার। বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'টেরা' বলতে বোঝায় একের পর বারোটা শূন্য। T3 সেই বিপুল ক্ষমতার এমন এক লেসার যন্ত্র যাকে গবেষণাগারের বেঞ্চেই বসিয়ে রাখা যাবে, নিয়ে যাওয়া যাবে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে। তৈরি হয়েছে সেই যন্ত্র। সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আবার দামেও অনেক সস্তা। রাস্তা খুলেছে আরও অনেক নতুন ধরনের গবেষণার। লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে কাজ চলছে পেটাওয়াট ক্ষমতার লেসার তৈরির; অর্থাৎ ওয়াট এককে যার ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে হলে একের পর পনেরোটা শূন্য বসাতে হবে।

সূর্যের মতো নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যে নিউক্লীয় সংযোজন অনবরত ঘটে চলেছে, পৃথিবীর মাটিতে সে ধরনের বিক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে লাগানো হচ্ছে এই টেব্‌ল-টপ লেসারকে। হাড়ের ছবি তোলার জন্য যে এক্স-রশ্মি ব্যবহার করা হয়, বর্তমানে সেই এক্স-রশ্মি তৈরির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে একে। আর চোখের চিকিৎসায়, বিশেষ করে মায়োপিয়া আর অ্যাস্টিগম্যাটিজ্‌ম-এর মতো রোগের চিকিৎসায়, এই টেব্‌ল-টপ লেসার প্রয়োগের কথা আজ আর কারোরই অজানা নয়।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরে পরেই এক সাক্ষাৎকারে ডোনা বলেছেন, জীবনে সবথেকে বেশি পরিশ্রমটা তিনি করেছিলেন ঐ CPA আবিষ্কারের সময়টাতেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে গেছেন শুধু মনের আনন্দে। আজ তার ফল ফলেছে। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের গরিমা নয়, সাদা আলোর রেখা একটা স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সাত-রঙা রংধনু তৈরি করছে, চোখ মেলে সেটা দেখাই তার কাছে সবথেকে সুখের। সেই আনন্দেই তিনি কাজ করে যান আরও অনেকদিন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা যে আরও কিছুটা শক্তিশালী হতে চাই।

Email : anindya05@gmail.com., M. 9432220412

অজয় মজুমদার

মোবাইল ঃ জনস্বাস্থ্যের ঘাতক

বিজ্ঞানীরা বলেন— জনস্বাস্থ্যের বড় শত্রু হল মোবাইল ব্যবহার।

বর্তমান নিয়মে, একটি এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি ও একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ব্যান্ডে ৫০ শতাংশের বেশি স্পেকট্রাম হাতে রাখতে পারে না কোনো সংস্থা।

এখন প্রশ্ন হল কি এই স্পেকট্রাম? লেখা, কথা বা ছবি ডিজিটাল সংকেত হিসেবে যাতায়াত করে কিছু বিশেষ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে। এই ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্কগুলির সমাহার বা গুচ্ছকে স্পেকট্রাম বলে। সহজ করে বললে, রাস্তা দিয়ে যেমন গাড়ি চলে, স্পেকট্রাম দিয়ে তেমনই মোবাইল সিগন্যাল যাতায়াত করে।

এখন বিষয়টি হল— মোবাইল পরিষেবা আজ আধুনিক সমাজে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এতে জনস্বাস্থ্য কতখানি বিঘ্নিত এ বিষয়েই একটু আলোকপাত করা যাক। ইটালির বিজ্ঞানী ম্যারিনিলি (Marinelli) একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বলেছিলেন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের ফলে ডি. এন. এ.-র মধ্যে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে মিউটেশন (Mutation) ঘটে। ডঃ ডেভিড পামরে (David Pamerai) মলিকুলার বায়োলজিস্ট এবং টক্সোকোলজিস্ট, হটিনহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যারিনিলির বক্তব্য সমর্থন করেন এবং বলেন— মোবাইল ফোন পরোক্ষভাবে ডি. এন. এ.-কে নষ্ট করে। কোষের মধ্যে ডি. এন. এ.-র মেরামত ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। ফলে তার কাজের ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রোটিন তৈরির সংকেত ডি এন এ-র মধ্যে থাকে। প্রোটিন উপাদান দুটি নির্দিষ্ট ধাপ বিশিষ্ট। প্রথম ধাপে ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতির মাধ্যমে ডি. এন. এ.-র সংকেত এম. আর. এন.-এতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ট্রান্সলোকেশান প্রক্রিয়ায় এম-আর-এন-এর সংকেত অনুসারে প্রোটিন গঠিত হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণে প্রোটিন সংশ্লেষে বাধা পড়ে। এছাড়া ম্যারিনিলি বলেন ক্ষতিগ্রস্থ ডি এন এ-গুলি ২৪ ঘণ্টা ধরে তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের এক্তিয়ারে থাকলে লিউকেমিয়া কোশে পরিণত হয়। এই রোগকে ব্লাড ক্যানসার হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে শ্বেতরক্ত কণিকা (WBC) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় এবং রক্তে অপরিণত শ্বেতরক্ত কণিকার জন্ম হয়। এই রোগটি শিশু এবং নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। এই রোগে রক্তশূন্যতা, প্লীহার বৃদ্ধি, বিভিন্ন গ্রন্থির বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্তের নরমোব্লাস্ট কোশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস যুক্ত অপরিণত লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ে। এর ফলে শ্বেতরক্ত কনিকার আর দেহ সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এক কথায় দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় দেহটি জীবাণুর নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠে।

মেডিসিনের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন— ১৯৯২ সালে ডেভিড বেনার্ড নামে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর প্রাণঘাতি মস্তিষ্ক ক্যানসারের জন্য মোবাইল ফোনকে দায়ি করে ফ্লোরিডার এক আদালতে একটি মামলা রুজু করেছিলেন। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে মামলা খারিজ হলেও আশঙ্কাটি মরেনি।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন— মোবাইল ফোন থেকে মাথার যে অংশের তাপমাত্রা বাড়ে, মস্তিষ্কের রক্ত পরিবহনের মাত্রা বাড়িয়ে সেই বর্ধিত তাপমাত্রাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। কিন্তু চোখের কর্নিয়ার সে ক্ষমতা নেই। তাই মোবাইল ফোনের বিকিরণজনিত কারণে চোখে তাড়াতাড়ি ছানিপড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশের মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত ৯০০ মেগাহাইট (MHz) কম্পাঙ্কের ভেদ ক্ষমতা খুবই কম। এই কম্পাঙ্ক শরীরের কোশ বা কলায় ১ সেন্টিমিটার ভেদ করতে পারে মাত্র। কম্পাঙ্ক যত বাড়ে, ভেদ করার শক্তি তত কমতে থাকে। এই কম্পাঙ্ক বা শক্তির ব্যবহারে কোশের মধ্যে জিনের নিয়ামক ডি. এন. এ. -র ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা। আর ডি এ-এর সুনির্দিষ্ট কিছু অপগঠন থেকেই ক্যানসারের জন্ম। ১৯৯৮ সালের সমীক্ষায় ডাঃ ব্রাউনে ও তাঁর সহযোগী গবেষকেরা দেখেছেন ৩৫ মিনিট টানা ৯০০ মেগাহার্জ (জি.এস.এম) মোবাইলে কথা বললে সমপরিমাণ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্ছুরণে (২ ওয়াট) রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। আরও কয়েকটি ক্ষতি হয়, তা হল— পেসমেকার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, হার্টবিট কমে যাওয়া। নাক-কান-গলার ডাক্তার কৌশিক দাস বলেন— এক নাগাড়ে মোবাইল ফোনে কথা বললে কানে ও মাথার একদিকে এবং ঘাড়ে ব্যথা করে, একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এছাড়াও টিটিএস বা টেম্পোরারি থ্রেসহোল্ড শিফ্‌ট নামক একধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলে সাময়িক ভাবে শ্রবণ শক্তি কিছুটা কমে যায়।

M. 8918824281

ভবানীপ্রসাদ সাহু

পয়া-অপয়া শুভ-অশুভ

কয়েক বছর আগে কলকাতার বাগবাজারে এক প্রতিবেশী বৃদ্ধকে মাথায় মেরে খুন করে ফেলেছিল সাইকেল সারাইয়ের দোকানদার এক ছেলে। নিঃসন্তান এই বৃদ্ধ ছেলেটিকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। প্রতিদিন সকালে ওর দোকানে এসে বসতেন। সেদিনও এসেছিলেন। কিন্তু অনেক বেলা অব্দি ছেলেটির দোকানে কোন খদ্দের আসেনি। ওর মাথায় খুন চড়ে যায়। বৃদ্ধের যেহেতু কোন ছেলে পুলে হয় নি, তাই সে ধরে নেয়, সে অপয়া। আর সকালে তার মুখ দেখার জন্যই দোকান খদ্দের শূন্য। ক্রোধ আর হতাশায় বৃদ্ধের মাথায় রডের বাড়ি মেরেই দিল।

কিংবা এই হাল আমলে গত ৩০শে নভেম্বর (২০১৮)-এর ঘটনা। বারাসতের সত্তরোর্ধ এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ভোরে উঠে নানা বাড়ি থেকে পুজোর ফুল সংগ্রহ করতেন। এমনই এক বাড়িতে কোন সন্তানসন্ততি হয়নি। এক সময় তারা ধরে নিল ঐ শিক্ষিকাই অপয়া আর তার কুনজর পড়ার জন্যই বাড়িতে বাচ্চা আসছে না। তার ওপর বাড়ির ফুলও বাইরে চলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ঐ বাড়ির দুই মহিলা ওই দিন সকালে বৃদ্ধা ফুল তুলতে আসতেই তাঁর উপর চড়াও হল। মাটিতে ফেলে মারধোর, তারপর মাথার চুল কেটে নেওয়া হল। পরের দিনের সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল খবরটি।

পয়া-অপয়া তথা শুভ-অশুভ জাতীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার কী নির্মম পরিণতি হতে পারে এমন ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। এমন চরম ঘটনা ঘটেছিল বলেই পরে কাগজের খবর হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা তো বহুজনের মধ্যে বহুভাবে আছেই। এবং তা নিছক কুসংস্কারই কারণ এইভাবে কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তি পয়া বা অপয়া হতে পারে না, কোনো কিছুকে বা কাউকে দেখাও শুভ বা অশুভ হতে পারে না। এক শালিক, একটি তারা বা কারোর শুধু এক চোখ দেখা শুভ নয়। ঠাট্টাচ্ছলে হলেও অনেকেই একসঙ্গে দুটো না দেখা অবধি শান্তি পায় না।

এছাড়া আছে নিঃসন্তান স্ত্রী বা স্বামী (বিশেষত তথাকথিত 'বাঁজা' মহিলা), মাকুন্দ, নিম্নবর্ণের মানুষ (তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে)— এই ভাবে মানুষজনকেও অপয়া ভাবা হয়। তাই সারাদিনের কোনো দুর্ভোগে 'আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে' জাতীয় কথা অনেকের মুখেই শোনা যায়। 'ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজতুরগা : দক্ষিণাবর্তা বহ্নি' জাতীয় সুন্দর ও প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকও আছে, যার অর্থ বাছুর-সহ গাভি, ষাঁড়, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিকে শুভ বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুভ-অশুভ পয়া-অপয়া ব্যাপারটিকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি আছে বিশেষ কোন দিনক্ষণকেও শুভ-অশুভ ভাবা। 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা যেথায় যাবি সেথায় যা' থেকে শুরু করে বারবেলা জাতীয় নানা হাবিজাবি কথাবার্তা চালু।

কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে জানা দরকার যে, এইভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে অপয়া বা অশুভ বলে চিহ্নিত করা চরম একটি অমানবিক কাজ। কাউকে অপয়া ভেবে তার শারীরিক নিগ্রহ করা আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অবশ্যই। কিন্তু নিছক কাউকে অপয়া ভাবাটাকেই আইনত শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত। আর পৃথিবী নিজের মতো ঘুরছে, দিনরাত্রি হচ্ছে। তার একটি বিশেষ সময়টি শুভ বা অশুভ হয়ে যাবে এমন চিন্তাটাই তলিয়ে ভাবলে হাস্যকর বলে মনে হয়। আর চোখ, শালিক, তারা ইত্যাদি দেখা না-দেখাকে শুভ-অশুভ ভাবাটা তো আরো হাস্যকর। কিন্তু মনের মধ্যে পয়া-অপয়া শুভ-অশুভ জাতীয় বিশ্বাস যদি থাকে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা বাগবাজার বা বারাসতের মতো চরম রূপ নিতে পারে। এই ধরনের শারীরিক-মানসিক নিগ্রহ বহু পরিবারে আর সমাজে কিন্তু নিরন্তর এখনো ঘটে চলেছে।

Email : sahoo23319536@gmail.com, M. 9733400443

জয়শ্রী দত্ত

ছাতা থেকে ডিজেল

আলমো বৃক্ষ

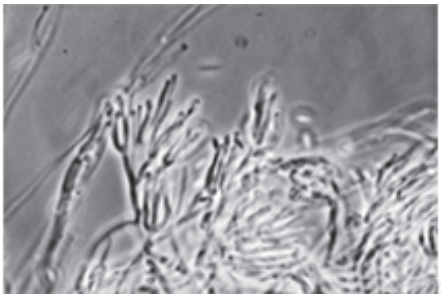

গ্লায়োক্লাডিয়াম রোসিয়াম

তুলোর মতো ছাতা

'ছাতা' বললেই মনে পড়ে বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা ধরার কথা। ছাতা ধরে বাসি রুটি, পচা কাঠেও। এরকমই একধরণের পচা কাঠে ধরা ছাতা থেকে পাওয়া গেল তেলের কণা।

দক্ষিণ আমেরিকায় পাটাগোনিয়া নামে একটা জায়গা আছে। সেখানকার গভীর জঙ্গলে আলমো নামে এক রকম বড় গাছের ভেতরে দেখা যায় ঐ বিশেষ ছাতা, ছাতার নাম গ্লায়োক্লাডিয়াম রোসিয়াম। সরু সুতোর মতো এদের আকৃতি, ছড়িয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। দিন সাতেকের মধ্যেই আক্রান্ত অংশ পুরোটা ঢেকে যায় তুলোর মতো ছাতায়। এই তুলোর মতো ছাতাগুলোর রঙ প্রথম দিকে থাকে সাদা বা হালকা ক্রীমের মতো, তারপর ধীরে ধীরে রঙ পাল্টাতে থাকে ক্রমশঃ গোলাপী সবশেষে ঘন সবুজ।

মনটানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা ঐ অঞ্চলে আলমো গাছের ওপরেই মাসকোডর অ্যালবাস নামে অন্য এক ছাতা নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। এই ছাতা থেকে বেশ কয়েকটা যৌগ পাওয়া যায়, এগুলো

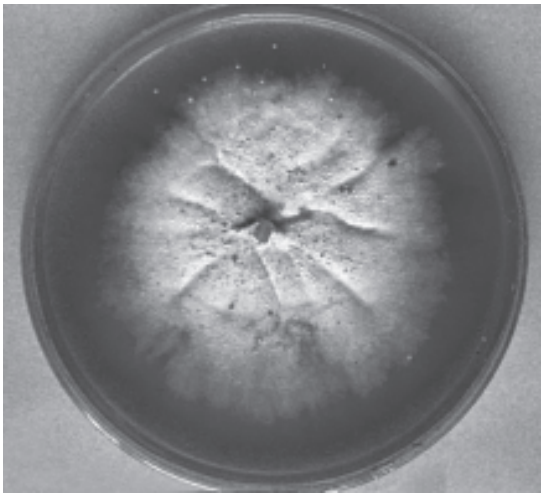

মাসকোডর অ্যালবাস চাষ

নিজেরাই ধীরে ধীরে গ্যাস হয়ে উবে যায় ঠিক কর্পূরের মতো। এদের বলে উদ্বায়ী যৌগ। এরা মানুষের ও গাছপালার ক্ষতিকর বহু কৃমি, ছত্রাক ও পোকামাকড় নষ্ট করে। মাসকোডর অ্যালবাস নামে এই ছাতাগুলোও গাছের ভেতরে তন্তুজাতীয় অংশে বা কাঠের ওপর অন্তঃপরজীবী হিসাবে জন্মায়। বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ছাতার ওপর ঐ উদ্বায়ী গ্যাসগুলো কি ধরনের কাজ করে সেটাই দেখছিলেন। সেইসময় তাঁরা দেখলেন ওইসব উদ্বায়ী গ্যাসের প্রভাবে যখন প্রায় সমস্ত ছাতা মরে যাচ্ছে তখনও ওখানে বেঁচে ছিল আর বেড়ে চলেছিল গ্লায়োক্লাডিয়াম রোসিয়াম। এটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা পরীক্ষা শুরু করলেন এই ছাতা নিয়ে। এই ছাতাও উদ্বায়ী গ্যাসীয় অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে। 'মনটানা স্টেট ইউনিভার্সিটির' বিজ্ঞানী গ্যারী স্ট্রোবেলের ভাষায় এই পরীক্ষার ফল গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাওয়ার মতো। তাঁরা গবেষণাগারে গ্লায়োক্লাডিয়াম তৈরি করে দেখলেন এতে আছে প্রচুর হাইড্রোকার্বণ আর হাইড্রোকার্বণজাত যৌগের অণু। এর থেকে যে তেল তৈরি হল তা' গাড়ি চালানোর ডিজেলের মতোই। জৈব জ্বালানী তৈরিতে গ্লায়োক্লাডিয়াম সাহায্য করতে পারে বিশেষ ভাবেই।

গাছের সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি হল আঁশ জাতীয় আর লিগনিন হল আঠার মতো, যার সাহায্যে গাছের আঁশগুলো একে অন্যের সাথে আটকে গাছকে সোজা রাখতে সাহায্য করে। এই জিনিসগুলো প্রাণীরা হজম করতে পারে না, এগুলো উদ্ভিজ্জ বর্জ্য হিসাবে জমা হয়। জৈব-জ্বালানী তৈরির জন্য এইসব বর্জ্য পদার্থ সেলুলোজ এনজাইম দিয়ে শর্করায় রূপান্তরিত করা হয়। তারপর বিভিন্ন অণুজীব এই শর্করাকে ইথানলে পরিণত করে। এই ইথানল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্লায়োক্লাডিয়াম রোসিয়াম সেলুলোজকে সরাসরি ভেঙ্গে মাইকোডিজেল তৈরি করে। ছাতা নিয়ে পড়াশোনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে মাইকোলজি। তাই ছাতা থেকে পাওয়া তেলের নাম দেওয়া হয়েছে মাইকোডিজেল।

এই আবিষ্কারের ফলে আর একটা ঘটনাও নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে। আমরা জানি অতি প্রাচীনকালের গাছ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ কোটি কোটি বছর ধরে নির্দিষ্ট চাপ ও তাপের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানীতে পরিণত হয়। গ্লায়োক্লাডিয়াম ছাতাগুলো যখন মাইকোডিজেল তৈরি করতে পারে, তখন ভাবতে বাধা নেই যে জীবাশ্ম তেল তৈরিতেও এই ছাতাগুলোরও একটা ভূমিকা থাকতে পারে।

গবেষণাগারে পাওয়া ছাতার তেলকে যদি বেশি করে তৈরি করা যায় তবে ভবিষ্যতে একদিন হয়তো ছাতার তেলে গাড়িও চলবে। ব্যাপারটা বেশ অবাক করার মতো তাই না!

Email : jayashree.datta@yahoo.com, M. 9831060548

বিজয় সরকার

জানো কি?

জোনাকি কিভাবে আলো দেয়?

ছোট পোকা জোনাকি। শহরের আলোয় এদের সেভাবে চোখে না পড়লেও গ্রামে রাতের বেলা জোনাকির আলো আমাদের মুগ্ধ করে। জোনাকি এই আলো পায় কোথা থেকে? জোনাকির শরীরের একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই আলো জ্বলে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের আলো সৃষ্টিকে বলে বায়োলুমিনেসন্স (Bioluminescence)। জোনাকির উদরের নিচে থাকে লুসিফেরিন (Luciferin) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ। এই লুসিফেরিন বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে যুক্ত হয়ে অক্সিজাইজড্ লুসিফেরিন তৈরি করে, যা থেকে আলো বেরিয়ে আসে। এবং এই বিক্রিয়া লুসিফেরাজ নামে একটি উৎসেচকের সাহায্যে ঘটে থাকে। জোনাকির আলো ঠান্ডা আলো। কোন তাপ নেই। এর কারণ হল জোনাকি তার শক্তির পুরোটাই আলোতে পরিণত করে, তাপ উৎপাদনের জন্য সে কোন শক্তি খরচ করে না। আমাদের দেশে শুধুমাত্র সবুজ আলোর জোনাকি পোকার দেখা মেলে, অনেক দেশে লাল আলো বিচ্ছুরণকারী জোনাকি পোকাও দেখা যায়।

আমরা ডান হাতে লিখি কেন?

পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ ডান হাতে লেখে বা কাজ করে। আবার কিছু লোক আছেন যারা বাঁ হাত দিয়ে লেখেন। এটা কিন্তু কোন শারীরিক ত্রুটি নয়। কোন মানুষ বাঁ-হাতি বা ডান-হাতি হবেন কিনা তা নির্ধারিত হয়ে যায় ভ্রূণ অবস্থাতেই। আমাদের মস্তিষ্কের সমান দুটি অংশ আছে—ডান দিক ও বাঁ দিক। দেখা যায়, একটি অংশ অন্যটির তুলনায় বেশি কর্মক্ষম। এই দুটি অংশের প্রত্যেকটি শরীরের এক-একটা দিকের দায়িত্ব নেয়। বাম মস্তিষ্ক নেয় শরীরের ডান দিকের দায়িত্ব, আর ডান মস্তিষ্ক দায়িত্ব নেয় বাঁ দিকের। প্রকৃতিগত ভাবে অধিকাংশ মানুষের বাম মস্তিষ্ক বেশি সক্রিয়, তাই আমরা ডান-হাতি। আর বাঁ-হাতি মানুষদের ডান মস্তিষ্ক বেশি কাজের।

Email : bijoysarkar4786@gmail.com, M. 9432335882

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অনিন্দ্য দে

সিগারেটের ধোঁয়া

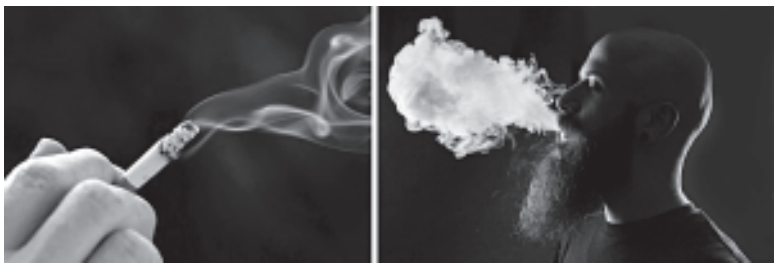

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই বলে সিগারেট নিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কিন্তু কোনও বাধা নেই। আজকে সেরকম একটা বিষয়ের কথাই বলব। খুব ভাল করে লক্ষ করলে দেখবেন, জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধোঁয়া যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন সেই ধোঁয়ার রঙ কিছুটা নীলাভ থাকে। কিন্তু পাকা ধূমপায়ীরা যখন সেই ধোঁয়া মুখের ভিতরে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার বাইরে ছেড়ে দেন, তখন তার রঙ হয় সাদা। বলতে পারেন এই পরিবর্তনটা কেন হয়?

যে কোনো ধোঁয়াই আসলে খুব ছোট ছোট কণার সমবায়। ধোঁয়ার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা আলো বিক্ষেপিত হয়। এই সমস্ত কণার আকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে ছোট হলে নীল রঙের আলো লালচে আলোর থেকে বেশি পরিমানে বিক্ষেপিত হয় (এটাই বিজ্ঞানী র‍্যালের বিক্ষেপন তত্ত্ব বা থিয়োরি অফ স্ক্যাটারিং)। সেই কারণেই পাশ থেকে দেখলে সিগারেটের ধোঁয়াকে কিছুটা নীলচে দেখায় (তবে সরাসরি সিগারেটের আগুনের দিকে তাকালে কিন্তু এই ধোঁয়াকে লালচে বা হলদে দেখাবে)।

সিগারেটের ধোঁয়া মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলে সেই ধোঁয়ার ছোট ছোট কণাগুলোকে কেন্দ্র করে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয়। ফলে যে জলকণা তৈরি হয় তারা আকারে অনেকটাই বেড়ে যায়; তাদের আকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। ফলে হলদে আলোর বিক্ষেপন অনেক বেশি হয়।

রতন দেবনাথ

চাঁদের দেশে চাঙ্গে ৪

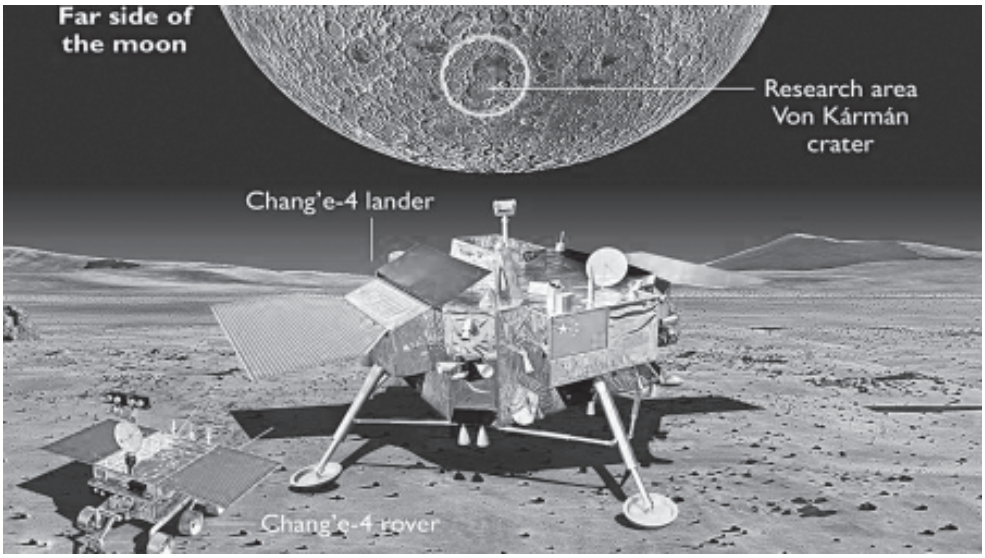

চন্দ্রাভিযান আজ আর নতুন কিছু নয়। বিগত ষাট বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যান পাঠাচ্ছে চাঁদে। এমনকী মানুষও পা রেখেছে চাঁদের মাটিতে। ভবিষ্যতে মানুষের আস্তানাও হয়ে উঠতে পারে চাঁদ। পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক এই বস্তুটি মানুষকে হাতছানি দেয় বারে বারে।

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। পৃথিবীকে ঘিরে তার চারপাশে অবিরাম ঘুরে চলেছে চাঁদ। পৃথিবীর গতির সঙ্গে চাঁদের গতি এমন মেলবন্ধনে আবদ্ধ যে পৃথিবী থেকে চাঁদের কেবল একটা দিকই শুধু আমরা দেখি। পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখি সেটাকে যদি 'কাছের দিক' বলা হয় তাহলে তার বিপরীত দিকটি হল 'দূরের দিক'। এই দূরের দিকটি আমাদের অগোচর। দূরের এই দিকটি আবার 'অন্ধকার দিক'ও বলা যায়। তবে আলোর অভাবজনিত অন্ধকার তা নয়। বরং দৃষ্টি অগোচর বলেই। চাঁদের দুটো পিঠই সূর্যের আলো যায় পক্ষকাল ধরে। পরের পক্ষে আবার অন্ধকার। তবে চাঁদের দূরের দিকটির সামান্য অংশ— শতকরা প্রায় আঠারো ভাগ— কোনো কোনো সময় পৃথিবী থেকে দেখা গেলেও অধিকাংশ এলাকাই থাকে না দেখা। তবে মানুষ তো ছাড়বার পাত্র নয়। উপায় খুঁজে নিয়েছে। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত মহাকাশযান 'লুনা ৩' ছবি তোলে চাঁদের সেই না দেখা পিঠের। সেই প্রথম পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে চাঁদের লুকোনো পিঠের পরিচয়। সোভিয়েত আকাদেমি অফ সায়েন্সেস চাঁদের দূরবর্তী অংশের মানচিত্রও প্রকাশ করে ১৯৬০ সালে। শুধুই ছবিতে নয়। অ্যাপোলো ৮ মহাকাশযানের নভশ্চরেরা চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে চাঁদের ওই পিঠটি দেখেও নেয় ১৯৬৮-তে।

এতকাল পর্যন্ত চন্দ্রাভিযানের সবটাই হয়েছে চাঁদের কাছের দিকটাতেই। সে মানুষ নামানোই হোক বা যন্ত্র। গত ৩ জানুয়ারি ২০১৯-এ ঘটেছে চন্দ্রাভিযানে এক নতুন অধ্যায়। এদিক চীন দেশীয় চন্দ্রযান 'চাঙ্গে-৪' সফলতার সঙ্গে অবতরণ করেছে চাঁদের ওই দূরের অংশে।

চাঙ্গে-৪ চৈনিক চন্দ্রাভিযান মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়। এর আগে ২০০৭-এ চাঙ্গে-১, ২০১০-এ চাঙ্গে ২ এবং ২০১৩-এ চাঙ্গে-৩ এর সফল অভিযান শেষে ২০১৯-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে চাঙ্গে-৪। চৈনিক দেবী চাঙ্গে যিনি চাঁদে গিয়েছিলেন তাঁরই নাম অনুসারে নামাঙ্কিত এই যানগুলি।

যে কোনো বৈজ্ঞানিক কাজের শুরুতেই নামতে হয় আটঘাট বেঁধে। চাঙ্গে-৪ ও তার ব্যতিক্রম নয়। মিশনের শুরুতেই ভেবে নেওয়া হয়েছে সবকিছু। যেহেতু চাঁদের যে দিকটি পৃথিবীর কাছে থেকে যায় অধরা সেই পিঠেই অবতরণের কথা চাঙ্গে-৪ এর। তাই অবতরণের পর পৃথিবীর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় চাঁদ নিজেই। চন্দ্রযানটির সঠিক অবতরণ নিয়ন্ত্রিত হবে পৃথিবী থেকেই। আর অবতরণের পর বিভিন্ন তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্যও পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কুইকিয়া নামে কৃত্রিম একটি উপগ্রহকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে রেখে একদিকে চাঁদ এবং অপরদিকে পৃথিবীর— এই দুয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাচ্ছে কুইকিয়াকে মাধ্যম করে।

উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা এবং লেসার কে কাজে লাগিয়ে চাঙ্গে-৪ কে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর আতকেন বেসিন স্থিত কারমান গহ্বরে নামিয়ে আনা হয়েছে অতি সাবধানে। চাঁদের নুড়ি পাথর বা খানাখন্দের সাথে সংঘাত এড়িয়ে প্রায় খাড়া এবং আলতো এই অবতরণ।

প্রায় ৩৭৮০ কেজি ভরের চাঙ্গে-৪ যানটির দুটি প্রধান অংশ— ল্যান্ডার এবং রোভার। ১২০০ কেজি ভরের ল্যান্ডারটির শক্তির যোগান দেবে একটি রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটার। ল্যান্ডার-এর সঙ্গে থাকা সাতটি কার্যনির্বাহী যন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ক্যামেরাগুলোতে শক্তি জোগাবে জেনারেটরটি।

ল্যান্ডার এবং রোভার-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে চাঁদের ভূ-তত্ত্ব, চন্দ্রাভ্যন্তর এবং সৌরঝঞ্ঝার পর্যবেক্ষণ করবে চাঙ্গে-৪। এ ছাড়াও চাঁদের কম মানের অভিকর্ষ ক্ষেত্রে উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব কিনা তাও দেখবে চাঙে।

Email : rdebnath1961@gmail.com, M. 9477934928

সংবাদ

❑ বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৬তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

২৭ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাকক্ষে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৬তম বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও 'খাদ্যে ভেজাল' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদক তাপস মজুমদার ও প্রকাশক জয়দেব দে-র স্বাগত ভাষণের পর প্রথম পর্যায়ে 'পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাসভায় সমর বাগচি, তপন সাহা, কল্লোল রায়, তপন দাস, রঘুনাথ কর্মকার প্রমুখরা পরিবেশ বিপর্যয় রোধে আরো সক্রিয় প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন। অনুপ হালদার আলোকচিত্র সহযোগে নদী দূষণের বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাসভায় কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, মানসপ্রতীম দাস, প্রকাশ দাসবিশ্বাস ও ভবানীপ্রসাদ সাহু প্রমুখরা বক্তব্য রাখেন। গণমাধ্যমকে পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিটি ইস্যুকে আরো গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরার কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পত্রিকার লেখকদের স্মারক সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ও পত্রিকার সম্পাদক তাপস মজুমদার জানান সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের জন্য পত্রিকাটিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলা হবে। এবিষয়ে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা আশা করেন। আগামী জুন মাসে বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার পক্ষ থেকে 'পাখি সব করে রব' শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করা হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০০-এর বেশি বিজ্ঞান ও পরিবেশকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

❑ পরিবেশের জন্য পদযাত্রা

২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দি গ্রিন ওয়াক, পরিবেশ বান্ধবমঞ্চ বারাকপুর, বিজ্ঞান দরবার, স্পোর, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব সহ রাজ্যের পরিবেশকর্মীরা উত্তরবঙ্গের গোরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলে পরিবেশের জন্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। মালবাজার, বাতাবাড়ি সহ বিভিন্ন বনবস্তি অঞ্চলে গ্রিন কর্ণারের আয়োজন করা হয়। পরিবেশকর্মীরা প্লাস্টিক ব্যবহার না করার আবেদন জানান, পাশাপাশি জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপর জোড় দেন। গ্রিন কর্নারে কল্লোল রায়, রাহুল দেববিশ্বাস, অনুপ হালদার, জয়দেব দে, রূপালী চাকলাদার সহ বহু পরিবেশকর্মী বক্তব্য রাখেন। ২৩ তারিখ গোরুমারা জঙ্গলের টেন্টে এক আলোচনাসভায় স্থানীয় পরিবেশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

❑ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

মানুষের জন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্য মানুষ এই ভাবনাকে সামনে রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পড়ুয়াদের নিয়ে নদিয়ার মোহনপুর ক্যাম্পাসে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করল 'পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস্)। যুবসমাজের জীবনশৈলী ও খাদ্যাভ্যাস একটু পাল্টে ফেললে কিভাবে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. শঙ্কর কুমার নাথ। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের লক্ষ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন পেস্-এর সম্পাদক অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। পড়ুয়াদের নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক ক্যুইজ ও পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্যুইজ পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন ছাত্র কল্যাণ ডিন শুভাশিস বটব্যাল, ভেটেরিনারী ও ডেয়ারি ফ্যাকালটির ডিন অজিত কুমার সাহু ও তরুণ কুমার মাইতি প্রমুখ।

শব্দের খোঁজে ৯ : আবিষ্কার

পলক বন্দ্যোপাধ্যায় • M. 9903424119

১			২		৩			
					৪	৫		
৬	৭							৮
				৯				
১০			১১				১২	
					১৩			
১৪								
				১৫				

পাশাপাশি :

২. ছোট গুটি বসন্ত (Small Pox) টীকার আবিষ্কর্তা।
৪. জোনাস ———, পোলিও টীকার জনক।
৬. কার্ল ———, সুইডিশ বিজ্ঞানী 'Bionomial Nomenclature'-এর উদ্ভাবক।
৯. জর্জ ———, ইনি রেলের ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।
১০. অটো ———, এই নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী 'Nuclear Fission' বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন।
১১. ——— ডাল্টন, ইনি রসায়ন শাস্ত্রে 'Atomic Theory-র প্রণেতা।
১২. হিগ্‌স বোসন কণাকে ——— Particle বলা হয়। ঈশ্বরিক।
১৩. টেলিভিশনের আবিষ্কর্তা।
১৪. এই বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ শিক্ষকের শিক্ষায় ডারউইন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিন-চারে ইঙ্গে পুত্র, দুয়ে-চারে মানুষের এক সত্তা, একে চারে ইংরেজ লেখিকা ——— অস্টিন।
১৮. বিজ্ঞানী গে লুস্যাকের আবিষ্কার এই রাসায়নিক পদার্থ। একে তিনে সহোদরা। একে দুয়ে ইঙ্গে একঘেয়েমী।

উপর নীচ :

১. কোয়ান্টাম মতবাদের "Exclusion Principle"-এর প্রণেতা উল্ফগ্যাং ———।
২. ডিএনএ-র ডবল হেলিক্স কাঠামোর প্রণেতা ফ্রান্সিস ক্রীক এবং ——— ওয়াটসন্।
৩. ম্যালেরিয়া জীবানুর আবিষ্কারক রোনাল্ড ———।
৫. পদার্থবিদ্যায় ১৯০২ সালের এই নোবেল বিজেতা তড়িৎ চৌম্বকীয় বিচ্ছুরণের উপর কাজ করেছিলেন যা পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের 'Special Theory of Relativity' উদ্ভাবনে সাহায্য করেছিল।
৭. মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিষ্কর্তা স্যার আইজ্যাক ———।
৮. রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কর্তা উইলহেম ——— রন্টজেন।
৯. জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ——— হকিন্স।
১০. ক্রীসচিয়ান ——— ১৬৫৬ সালে পেন্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কার করেন।
১১. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একজন অন্যতম জনক প্যাস্কুয়েল ———, মধ্য-প্রাচ্যের এই দেশের রাজধানী আম্মান।
১২. বিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ ——— গৌল্ড যিনি লেজার রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেন এবং LASER শব্দের প্রণেতা।
১৩. ইংরেজ ধাতুবিদ রবার্ট ———, আমাদের দেশে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কাজের অভাবে এই অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

শব্দের খোঁজে ৮ : সমাধান

১ ন	র্ম	২ দা		৩ বি	হা	৪ র		৫ ম
		৬ বা	হা	মা		জ্ঞ		হা
৭ কা	ন	ন		ন		৮ ন	র্মা	ন
রা		ল			৯ ভ			গ
কো			১০ অ	স্ব	র		১১ সা	র
১২ রা	ম	১৩ ধ	নু		১৪ ত	রা	ই	
ম		লে		১৫ গা			১৬ বা	১৭ ন
	১৮ অ	শ্ব	গ	ন্ধা		১৯ গো	র	ক্ষ
		রী		র				এ

রক্ত হাঁটে

জগন্ময় মজুমদার

রিলে রেসে প্রত্যেকের ভূমিকা রয়েছে।

দত্তক নেওয়ার পরে জানা গেছে
দামিনী দক্ষিণী মেয়ে
আয়নার সামনে নাচে মোহিনীআট্টম
কেউ শেখায়নি।

রক্ত হাঁটে।

কিছু সিঁড়ি ভেঙে গেছে— মা ও বাবার
স্বীকৃতি ছিল না। এক জন্মেই নয় সব পরিচয়।
আতশে চোখ রেখে দেখে একজন
আদিম পৃথিবী
জলে ও জেলিতে ভাসে সদ্যোজাত ডি. এন. এর ভাইবোন

কার্টুন : সৌরভ মুখার্জী *M. 9830470334*

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 ● কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 ● নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 ● উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 ● ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 ● শিয়ালদহ ও যাদবপুর স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak